



রা জ ব ন



R

a i v a n a



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

ৰাজবন

RAJVANA

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্য নব নির্মিত “সাধনাকুঠি” দানোৎসৰ্গ
এবং

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ নন্দপাল স্থবির ও বোধিপাল স্থবির ~~মহোদয়গণের~~
“মহাশুবির বরণ” উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ~~বিশেষ সংকলন~~ ^{তৃতীয়}



ঃ সংকলন সম্পাদনা পরিষদ :

✽ আহ্বায়ক :

□ নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

✽ সদস্যবৃন্দ :

□ সুনীতি বিকাশ চাক্মা (সক্ৰ)

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

। নির্মল কান্তি চাক্মা

□ সুশোভন দেওয়ান (ববি)

□ সম্ভিজিত কুমার চাক্মা

ৰাজবন RAJVANA

শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডের জন্য নব নিৰ্মিত “সাধনাকুঠি” দানোৎসৰ্গ
এবং

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ নন্দপাল স্থবির ও শ্রীমৎ বোধিপাল স্থবির মহোদয়গণের
“মহাশ্রবির বরণ” উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংকলন

প্রকাশনায়ঃ

দানোৎসৰ্গ ও মহাশ্রবির বরণ উদযাপন কমিটি

ৰাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

ৰাজবন, ৰাজামাটি-৪৫০০

ৰাজামাটি পাবত্য জেলা

প্রকাশকালঃ

১৫ই মাৰ্চ ১৯৯৪ ইং

১লা চৈত্র ১৪০০ বাংলা

২৫৩৭ বুদ্ধাব্দ

প্রব্ধ সংশোধনেঃ

সঞ্জয় বিকাশ চাক্ৰা

নব কুমাৰ তঞ্চঙ্গ্যা

প্রচ্ছদ-কম্পিউটার গ্রাফিক্স :

আতিকুল ইসলাম

কম্পিউটার কম্পোজ ও

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান :

বিন্যাস

৪২ শৈল বিতান, ৰাজামাটি

মুদ্রণ :

নিও কনসেপ্ট লিঃ, চট্টগ্রাম

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপদেশ বাণী

১৯৭৪ সনে রাজ্যমাটিতে আসার আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রাক্কালে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিম্নোক্ত উপদেশ বাণী সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য বলেনঃ

“মাতা পিতার সেবা করা, নিত্য পঞ্চশীল পালন করা অর্থাৎ কোন প্রাণীকে বধ-বন্ধন-দণ্ড দ্বারা প্রহার না করা, পরদ্রব্য লোভ ও চুরি না করা, পরস্রী হরণ ও ব্যভিচার না করা, মিথ্যা-কটু-বৃথা ও ভেদ -এই চারি প্রচার বাচনিক পাপ না করা, সুরা-গাজা-আফিম ইত্যাদি যত প্রকারের নেশা জাতীয় দ্রব্য পান না করা, জুয়া খেলা ত্যাগ করা, কোন জীবের প্রতি হিংসাভাব পোষণ না করা, সর্বপ্রাণীকে সমভাবে দয়া করা, ক্রোধ ত্যাগ করিয়া অক্রোধ হওয়া, পরের দোষ অন্ত্রেষণ না করা, অপরকে ভৎসনা না করা, পরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অর্থাৎ নিজে কি ভাল, কি মন্দ, ন্যায় বা অন্যায় কি করিয়াছি সেবিষয়ে নিজের প্রতি লক্ষ্য করা, সহিষ্ণু থাকা, কুশল কার্য্য করিতে নিষ্ঠীক হওয়া, ক্ষান্তিভাব পোষণ করা অর্থাৎ ক্ষমাশীল হওয়া এবং সর্ব জীবের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করা এই নীতিগুলি পালন করিলে সুখ লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীমৎ সাধনানন্দ স্থবির (বনভন্তে)

তিনটিলা বনবিহার

লংগদু, রাজ্যমাটি।

সবিনয় নিবেদন

চাক্‌মা রাজ বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে হুদে ঘেরা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ভূখণ্ডটি একসময় চাক্‌মা রাজার নয়নাভিরাম ফলোদ্যান ছিল। তৎপর এক শুভ মুহূর্তে মহান সাধক শ্রদ্ধেয় বনভন্তের পবিত্র পাদস্পর্শে উহা অমৃত সজ্জাবনায় ধন্য হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে সেই ফলোদ্যান এখন মহা পূন্যতীর্থ রাজবন তথা “রাজবন বিহার”।

ইহার পশ্চিম প্রান্তে বোধি বৃক্ষ, ভিক্ষু সীমা সহ কেন্দ্রস্থলে শান্ত সুশীতল ছায়াতলে স্থাপিত হয়েছে সুরম্য বিহার, ভিক্ষু সংঘের বাসোপযোগী বিবেক ভবন, সাধনানন্দকুটির, পূন্যার্থীদের জন্য সাময়িক আবাসভবন। দুটি মনোরম বিহারে অষ্ট ধাতুনির্মিত সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। মনোরম স্বর্গীয় সুষমামভিত এই বনবিহার পরিবেন বিবেকজ্ঞ প্রীতি ও প্রসন্নতা লাভের উপযুক্ত স্থান। এই পূন্যতীর্থে অগণিত নরনারী পরম পূজনীয় মহান আৰ্য পুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়কে দর্শন করে ও তাঁর দেশিত সদ্ধর্ম দেশনা শুনে ধন্য হয়। এই পূন্য তীর্থ সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধদের কাছে অন্যতম পরম পূন্যময় তীর্থরূপে পরিগণিত।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য স্বরূপ মিস্‌ লাকী চাক্‌মার অগ্রণী ভূমিকায় ও সর্ব সাধারণের শ্রদ্ধাদানে সর্বস্বত্বতে তাঁর বাসোপযোগী বিশেষ আঙ্গিকে একটি মনোরম ও মনোজ্ঞ কুটির ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই কুটির উৎসর্গ কল্পে ১৪ ও ১৫ই মার্চ '৯৪ ইং দু'দিন ব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমদিনে মহান আৰ্য্যপুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরের কঠিন সাধনা, তাঁর ঋদ্ধজীবন ও কর্মে এতদঅঞ্চলে বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়ন এবং এই পূন্য তীর্থ রাজবনবিহারের ক্রমপর্যায়িক সমৃদ্ধির বিবরণ সম্বলিত প্রবন্ধের ভিত্তিতে একটি আলোচনা সভা ও দ্বিতীয় দিনে এই কুটির উৎসর্গের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এইসব চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ সংকলনের প্রয়াস।

এই সংকলন প্রকাশের জন্য যারা সার্বিক সহায়তা দান করেছেন তাঁদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ধর্মপ্রান দায়ক দায়িকা যাদের শ্রদ্ধাদানে এই মনোরম বিহার নির্মাণ সম্ভব হয়েছে তাঁদের শ্রদ্ধাদান ও কুশল কর্মের ফল তাঁদের ভাবীকালে অশেষ কল্যাণের কারন হোক এই কামনা করি। স্বল্পসময়ের মধ্যে এই বিশেষ সংকলন প্রকাশ সম্ভব করায় বিন্যাস কম্পিউটার্সকে ধন্যবাদ। অনবধানবশতঃ সংকলনে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে- তজন্য সুধীবৃন্দের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

সম্ভেষ সন্তা সুখীতা হোন্তু---।

নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

আহুবাযক

তারিখ :

১৪ই ও ১৫ই মার্চ '৯৪ ইং।

বিশেষ সংকলন প্রকাশনা পরিষদ

রাজবন, রাজামাটি।

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতির বক্তব্য :

যুগ যুগ ধরে পাহাড়ী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র শৈল শহর রাঙ্গামাটি। এ'শহরের এক প্রান্তে অরণ্যঘন ছায়া সুনিবিড় অনুচ্চ ভূভাগে অবস্থিত রাজবন পরিবেণ। এখানে সগৌরবে শোভমান রয়েছে সুউচ্চ চূড়া বিশিষ্ট মূল রাজবন বিহার ভবন, উপাসনা বিহার, ভিক্ষুসীমা (ঘ্যাথ)। চংক্রমণ-শালা, ভিক্ষু নিবাস, ভিক্ষুসংঘ ও শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ভোজনশালা। পবিত্র বোধিবৃক্ষ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধা পাকা কুটির সমাকীর্ণ সুপ্রসিদ্ধ রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠান; যা পার্বত্যঞ্চলের বৌদ্ধ জনগণের ধর্ম প্রাণতার এক গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি। দানশীল চাকমা রাজ পরিবার কর্তৃক দানকৃত রাজ ফলোদ্যানের জায়গায় ১৯৭৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি পূণ্যকামী দাতাদের শ্রদ্ধাদানে পরিচালিত এই বিনয় সম্মত ধর্মীয় পীঠস্থান বৌদ্ধ ধর্মীয় চর্চা ও শিক্ষালাভের কেন্দ্র বিন্দুরূপে আজ সগৌরবে নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। একটি সার্বজনীন ধর্মীয় কেন্দ্র, পবিত্র পূণ্যতীর্থ ও শমথ-বিদর্শন ভাবনাকেন্দ্র হিসেবে এর প্রসিদ্ধির কথা আজ দেশে-বিদেশে পরিব্যাপ্ত।

বিগত দেড়যুগ ধরে বিরাজিত পার্বত্য পরিস্থিতির শত প্রতিকূলতার মাঝে অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত ও দারিদ্র ক্লিষ্টতা সত্ত্বেও পূণ্যকামী দাতারা তিল তিল করে ত্যাগ ও তিতিক্ষার বনিময়ে এ'পবিত্র প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও উন্নয়নে যে গৌরবময় অবদান রেখেছেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর বর্তমান পর্য্যায়ে অগ্রগতি তাঁর জাঙ্ঘল্যমান সাক্ষ্য বহন করছে। এতদঞ্চলের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির ধর্মীয় সচেনতা, ত্যাগশীলতা ও ধর্মানুরাগের ফসল রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠান।

ব্যক্তিগত উদ্যোগ, এলাকাবাসী মিলে যৌথ উদ্যোগে ও সার্বজনীন শ্রদ্ধাদানের সাহায্যে এবং বিহার পরিচালনা কমিটির সক্রিয় প্রচেষ্টায় এ' পবিত্র প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত গতিতে নিত্য প্রবহমান রয়েছে। আবাসিক ভিক্ষুসংঘের সুখবিহার কল্পে

সুবিধা সৃষ্টির জন্যে আরো বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। মিস্ লাকী চাকমার অগ্রণী ভূমিকায় ও পুন্যকামী দাতাদের শুদ্ধাদানের সাহায্যে শঙ্কেয় বনভন্তের বাসস্থানের জন্য সদ্য নির্মিত কুটিরটি অত্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আরো একটি নতুন সংযোজন। এধরনের মহৎকাজে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আরো অনেকে এভাবে উন্নয়নমূলক কাজে এগিয়ে আসবেন বলে আমরা আশাবিত্ত।

আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে কুটিরটি দানোৎসর্গের মধ্য দিয়ে বিহারদানের দ্বারা মহাপুণ্য সঞ্চয়ের যে সুযোগ হয়েছে তা' অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যাদের সক্রিয় অবদানে একাজ সম্পন্ন হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সাধুবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি এ' পুণ্যময় স্থতিকে ধরে রাখার জন্য বিশেষ সংকলন প্রকাশের পেছনে যারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতিও সন্তুজ্ঞ সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সকল প্রাণী সুখী হোক।

সুনীতি বিকাশ চাকমা (সক্ক)

সভাপতি

তারিখঃ রাজবন

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

১৫ই মার্চ, ১৯৯৪ইং।

রাজ্যমাটি

প্রতিবেদন

পরম শ্রদ্ধেয় বনভত্তের জন্য নবনির্মিত পাকা কুটিরভবন দানোৎসর্গ উপলক্ষে কিছু লিখতে গিয়ে আজ একটি বিষয় বার বার মনে পড়ছে, তা হচ্ছে— এমন এক সময় ছিল রাজ্যবন বিহার উন্নয়ন কাজে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পরিচালনা কমিটিকে যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়েছিল। তখন দেখেছি দেশনাঘরটির জন্য প্রয়াত প্রাক্তন সম্পাদক বাবু স্নেহকুমার চাক্মাকে তার নিজের ঘরের চালের টিন খুলে দেশনাঘরটির কাজ শেষ করতে হয়েছিল। কিন্তু আজ পরিচালনা কমিটির নিজস্ব উদ্যোগ এবং ব্যবস্থাপনা ছাড়াও ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত উদ্যোগ এবং ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্যধীক টাকার বিনিময়ে অনেক উন্নয়ন কাজ সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় বনভত্তের জন্য নবনির্মিত পাকা কুটিরভবনটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ'রাজ্যবন এলাকাটি যে বুদ্ধ ধর্মের লন্ডন শহরে পরিণত হবে সেদিন মনে হয় খুব বেশী দূরে নয়।

পার্বত্যঞ্চলের আপামর জনগণের অর্থনৈতিক দিক থেকে অতীতের চাইতে বর্তমানে খুব একটু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং বলা যায় এতদঞ্চলের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উন্নতির চাইতে অবনতিই হয়েছে বেশী। এহেন অর্থনৈতিক দৈন্যতার মাঝেও বনবিহার উন্নয়ন অগ্রগতিকে লক্ষ্য করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রদ্ধেয় বনভত্তের সুদীর্ঘ একক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে অত্রাঞ্চলের জনগণের মনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ'কারণেই হয়তো শ্রদ্ধেয় বনভত্তে কোন একসময় দেশনা প্রসঙ্গে এ'রাজ্যবন বিহার একদিন লন্ডন শহরে পরিণত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বড় বড় ইমারত গড়ে লন্ডন শহর তৈরীর কথা বলেননি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন মনের উন্নতির উৎকর্ষ সাধন করার মাধ্যমেই লন্ডন শহর গড়া।

আজকে যে কুটিরভবনটি কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানের আয়োজন, এটি মিস্ লাকী চাক্মার উদ্যোগে তার নিজস্ব এবং আপামর জনগণের স্বতস্কৃত শ্রদ্ধাদানের অর্থে একটি স্বতন্ত্র নির্মাণ কমিটির পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে। এমনিভাবে অতীতেও ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উদ্যোগে অনেক উন্নয়ন কাজ সাধিত হয়েছে। প্রয়োজনে এ'সব উন্নয়ন কাজে পরিচালনা কমিটি আর্থিক সহায়তা প্রদান সহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছে।

বর্তমানে মাননীয়া রাজ্যমাতা রাণী আরতি রায়, বাবু ইন্দ্রনাথ চাক্মা ও মিস্ লাকী চাক্মার উদ্যোগে শ্রদ্ধেয় বনভত্তের ব্যবহৃত কীচা চক্রমণ ঘরটি ভেঙ্গে একইস্থানে একটি পাকা চক্রমণ ঘর নির্মাণাধীন রয়েছে। এতে সাধ্যমত শ্রদ্ধাদান

দিয়ে উন্নয়নকাজ ত্বরান্বিত করা আমাদের সকলের একান্ত প্রয়োজন। রাজবন এলাকায় দ্রুত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে পরিচালনা কমিটির সকলের সমন্বিত প্রয়াসের পাশাপাশি একক ও সমষ্টিগত পর্যায়েও এতে অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। তাই পরিচালনা কমিটি এ ব্যাপারে সবাইকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। প্রয়োজন সাপেক্ষে সম্ভাব্য যে কোন ধরনের সহায়তা প্রদানে পরিচালনা কমিটি বদ্ধপরিকর।

শ্রদ্ধেয় বনভত্তের মত মুক্ত পুরুষের আবির্ভাব অত্রাঞ্চলের সকল বৌদ্ধ জাতীর গৌরব, বাংলাদেশের গৌরব তথা সমগ্র বিশ্ব বৌদ্ধজাতী সত্ত্বা সমূহের গৌরব। বর্তমানে এটি শুধু বৌদ্ধতীর্থস্থান নয়, এটি একটি বড় পর্যটন কেন্দ্রেও পরিণত হয়েছে, আর তাই যে' কারনে প্রতিনিয়ত পূন্যার্থীর পাশাপাশি বহু দেশী-বিদেশী পর্যটকের সমাগম অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক নৈতিক অবক্ষয় রোধ কল্পে এবং পর্যটন শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অত্র রাজবন এলাকায় যাদুঘর নির্মাণ, ধর্মশালা নির্মাণ, সুউচ্চ প্যাগোডা নির্মাণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাননীয় সদাশয় বাংলাদেশ সরকারের সুদৃষ্টি আমাদের একান্ত কাম্য।

জীবন ও জীবিকার কঠিন বাস্তবতায় আমরা সবাই পিষ্ট, ক্লিষ্ট ও জর্জরিত। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে আমরা কত কিছুইনা করে থাকি তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু বুদ্ধের মূল নীতি আদর্শের ভিত্তিতে দুঃখ মুক্তি নির্বান সাক্ষাতের লক্ষ্যে আমরা সবাই এক ও অভিন্ন নীতিতে বিশ্বাসী। কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস, চারি আর্য় সত্যের প্রতি বিশ্বাস। এখানে অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় অন্ধভাবে বিশ্বাসের কোন অবকাশ নেই। আর তাই বুদ্ধধর্মে আচরণ, অভ্যাস ও অনুশীলনকেই বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আজকে আমরা একই বিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে এরূপ একটি মহৎ পূন্যের কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়েছি। এ পূন্যকাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের মূল্যবান পরামর্শে এর পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাদের সবাইকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দকেও জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

“সকল প্রাণী সুখী হোক”

সঞ্জয় বিকাশ চাক্মা

সাধারণ সম্পাদক

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

ও

অনুষ্ঠান উদ্বাপন কমিটি

সূচীপত্র

প্রবন্ধঃ

১. Rev. Vanabhante, the
Great Monk and the
Rajvan Vihar. Suniti Bikash Chakma (Sakka) ১১
২. বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় ও
সামাজিক উন্নয়নে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ
সাধননানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)
মহোদয়ের অবদান শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ১৮
৩. প্রকৃত আমি কে? শান্তিময় চাকমা ২৬

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রথম প্রচ্ছদঃ

মিস লাকী চাকমার উদ্যোগে ও সর্ব সাধারণের শ্রদ্ধাদানে
শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্য নব নির্মিত আবাসিক ভবন “সাধনাকুটির”
যাহা অদ্য দানোৎসর্গ করা হইতেছে।

শেষ প্রচ্ছদঃ

শ্রদ্ধাবান মহিলাগণের উদ্যোগে ও সর্ব সাধারণের শ্রদ্ধাদানে
শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্য নির্মিত ভোজনশালা যাহা ৪ঠা কার্তিক
১৩৯৫ বাংলা দানোৎসর্গ করা হয়।

Rev. Vanabhante, the Great Monk and the Rajvan Vihar.

Suniti Bikash Chakma (Sakka),

President, Rajvana Vihar Managing Committee

Rev.Sadhanananda Mahathero, better known as Vanabhante is a Great Ascetic and a Great monk as the possesor of supramundane Dhamma. He was born in a middle class Chakma Buddhist family in 1920 in a hamlet named Maroghona of Mogban Mouza, six miles away from the Rangamati Town. He is the eldest amongst the five children of his father Mr.Kharu Mohan Chakma and the mother Mrs.Birapati Chakma. He was named, Rathindra. He received his upper Primary education in his native village School.

It is learnt that, in his household life he was a pious man. Worldly pleasures could never attract his attention. Rev.Bhante expressed that, in his household life he would always reflect thus,- "the worldly life is confined of sufferings and impurities and very hard to live. Although he knew no grief, he realized the worthlessness of worldly life and pleasures in it". His contemplative nature did not permit him to spent a worldly life and a day came in 1949, when he leaving all behind, left the world with the end in view to know what the Buddhism is and thereby attain the goal of absolute happiness. He approached Ven.Dipanker Bhikkhu, the Head monk of the Nandankanan Buddhist

Temple of the Chittagong town, where he was ordained as a Sramaner (novice monk) under his guidance. The monetary cost involved for his ordination as a Sramaner was beared by one Mr. Gajendra Lal Barua of the village Nankine under the Patiya Police Station, in the Chittagong district.

His preceptor Ven. Dipanker Bhikkshu is a higher educated monk. When he could not quench his thirst for enlightenment with his teachings he politely took his leave from him and left the place, on the journey he resided at Pomra Buddhist Temple for some days and arrived to Chitmaram Monastery in the Chittagong Hill Tracts. Being advised by the high priest of the said monastery he left Chitmaram and arrived to Kangrachari Vihar in the Raingkhong valley. He resided there for some months and left it seeking for a suitable place for meditation. Lastly he arrived Danpata. The Danpata is a Chakma village and thereby was a deep forest, he entered into it for meditation to achieve his desired object.

Without a preceptor he started meditation with austerity. He had no abode in the forest for his shelter in day or night except the shady trees. With no possession to call his own but a bowl to collect food and robes just sufficient for a Sramaner, he absorbed himself in intense meditation. He stated that, to conquer hunger he used to come out for begging at an interval of one or two days and to master over sleep he would remain standing in the sunngrass at noon and neck-deep water at night in the cold seasons. Darkness of

ignorance began to disperse gradually, he saw dim light of enlightenment, along with he gained some supernatural powers. His name as Rathindra Sramaner was spread far and near.

Before the inundation of the surrounding areas of his meditation spot by the swelling waters of the Kaptai lake in 1960, being invited by one of his devotees Nishimani Chakma he moved to Dighinala about fifty five miles away to the north of the Rangamati town. He began to sojourn in a hermitage in the deep forest of Dighinala, in the midst of ferocious animal. Such was his arduous course.

Rev. Bhante told that, - he remained as a novice for twelve years - although he could have become fully an ordained monk soon after he became a Sramaner. But he waited until the full attainment of enlightenment and felt himself mature enough to expound the Dhamma in the real sense. Finally when he decided to be ordained as a Bhikkhu (monk), he was awarded "Upasampada" by the Great Bhikkhu Sangha in 1961. Since then he is better known as the "Vana Bhante", meaning the Bhikkhu, who lives in the forest.

Rev. Vanabhante resided at Dighinala for ten years and then went to Durchari in the Kassalong Valley, where he resided for a few months and lastly being invited by the people of Tintila of Langadu he moved there in 1970. He resided at Tintila Bana Vihar upto the month of May, 1977, since he has been living permanently at his

present abode at the Rangamati RajVan Vihar. During his stay at Tintila a large Pucca Buddhist Temple was erected at Tintila and the performance of first Kathina Civara Dana in the manner of Visakha was ceremonially offered to the great Bhikkshu Sangha on 6th November, 1973. Such a great task of historial importance have been possible to perform only by the inspiration,encouragement and blessings of the Rev.Vanabhante.

In 1974,Kathina Civara Dana was also ceremonially offered in the above said manner to the Great Bhikkshu Sangha at Rangamati Raj Vihar.Being invited by the devotees of Rangamati Rev.Vanabhante attended the said Kathina Civara Dana ceremony and after residing at Rangamati for a few days he went back to Tintila. Again being invited by his devotees headed by the Chakma Royal family he came down to Rangamati in 1977 and since then he has been living here.

To delincate the portrait of Rev.Vanabhante is an impossible task. In case of a ordinary man to describe the greatness of his qualities may be either exaggration or a under estimate. He asserts that,"extinction and detachment are bliss. He expresses that,he has shunned of ignorane and extinguished the craving for life and body forever.

Rev.Bhante is a speaker of varied topics.He explains the Dhamma lucidly and simply in Chakma,Bengali and Chittagonean dialect.His style of expression is terse and epigramatic. He culls instances from the daily life of us and

they are full of precepts, meditation, knowledge and wisdom. His expositions of religious topic is unheard of. Faculties leading to enlightenment the Eightfold Noble Path, and Four Noble Truths are the subject matter of his teachings. He maintains that, Buddhism is very great, very profound and sublime in its aspects beyond the perception of man of common knowledge and the real happiness consists in it. He roars like a lion- "subdue your ego, mind and sense-organs and observe celibacy then only you come to journey's end" He is striving hard day and night to put his devotees in the right path of the Eightfold Noble Path and the Four Noble Truths.

As a matter of fact Rev. Vanabhante has become indispensable and inseparable to the Buddhist people of this hilly region of Bangladesh including the Chittagong district. He has been travelling around this region to teach the Dhamma. Rev. Vanabhante had convinced many young men to accept the Buddhist order and thus rites and rituals of Dhamma have been established in the real sense. His objectives are to disseminate the teachings of the Lord Buddha to as many people as possible and to purify their mind. Any one irrespective of castes and creeds can approach him when he is not in meditation. In order to assimilate Buddhism into the Buddhist community Rev. Bhante is advocating humanistic and living Buddhism. His preception is that, Buddhist practitioners should spread the teachings of Lord Buddha to every one. In addition he

carries out his own ideals through the means of diligence. Rev.Bhante has also brought manastic practices to the laity. Moreover his mission is not only to each of us to attain enlightenment but for all us to help others as well.

He is an epoch-maker in the history of the Buddhist people of this region. He has kindled the light of Buddhism here.His tireless teachings have turned the RajVan Vihar into a holy pilgrimage. To get rid of their sufferings visitors from far and near overcrowded the Rajvan Vihar in day and night.

The Rangamati Rajvan Vihar was established in 1974.It has become a sacred Buddhist Shrine and also a holy pilgrimage of the Buddhists. It is situated in a quite and peaceful wooded corner in the close proximity of the Chakma Rajbari on an area of about 15 acres.The area was once a fruit garden belonging to the Chakma Royal family.The land was donated to Rev.Vanabhante by the Chakma Royal family,in 1974.At that time a cluster of bamboo huts were erected there as temporary resident for Rev.Vanabhante. It has now grown to a maze of temples. Moreover it has become a great centre of learning in the purest Theravada tradition. We are very much sure that under the guidelines of Rev.Vanabhante the Rajvan Vihar with a solid foundation and rapid progress will be able to uphold the great teaching of Lord Buddha for the cause of Dhamma being inspired with great lesson of universal love to all beings and also hope to bring peace and happiness to the suffering humanity.

It is a great pleasure that,Buddhist people of some areas of this hilly region have been able to establish Regional Branch Vihars of Rev.Vanabhante. The names of the Zamachuk Banashram of BandukBhanga mouza,the Jurachari Vana Vihar in the Subalong valley and the Furamoin Vana Vihar are such branches may be worth mentioned.A good number of Rev.Bhante's disciples are now residing in those vihars and some of them now engaged in meditation in the deep forest.

The Buddhist people are indeed fortunate for the opportunity of receiving the guidance of a great monk like Rev.Vanabhante.Let us adore him with our heartfelt devotion and try to carry out his instruction,because he is better served when his teachings are put into practice and work for Dhamma sincerely for the bright future.

May the blessing of three precious one be on all sentient beings.

বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভণ্ডে) মহোদয়ের অবদান শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS বা আন্তর্জাতিক বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের মুখপত্র থাইল্যান্ড থেকে প্রকাশিত W. F. B. REVIEW পত্রিকার ১৯৮৩ ইং ২৫২৬ বুদ্ধাব্দের অক্টোবর-ডিসেম্বর, ত্রৈমাসিক চতুর্থ সংখ্যায় BUDDHISM AND THE CHAKMA শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। "Now the chakma is one of the main Buddhist community of the world. By virtue of observing religions canon and practising Buddhism they are now comparable with any other Buddhist community." এক্ষণে মর্মার্থ হল এই যে, বর্তমানে চাকমারা বিশ্বের অন্যতম উন্নত বৌদ্ধ সম্প্রদায়। শ্রদ্ধার সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপন এবং বৌদ্ধধর্মের রীতি নীতি অনুশীলনের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে যে কোন সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের তুলনা করা যায়। অর্থাৎ তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে আর পিছিয়ে নেই, বরঞ্চ অনেক অনেক অগ্রবর্তী হয়েছে।

অথচ পূর্বেকার অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে এক বিষাদময় বৈপরীত্য বিদ্যমান। এখন হতে দুই কি তিন দশক পূর্বেও এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণ নিজেদের প্রকৃত বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল। তখন বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানব্যতীত অন্য কোথাও বৌদ্ধ বিহার বা ক্যং ও বুদ্ধমন্দির ছিলনা। রাজ্যমাটিতে চাকমা রাজা বিহার গৌতমমুনি মন্দির, আনন্দ বিহার, বড়াদমে স্বনামধন্য কামিনী মোহন দেওয়ানের বুদ্ধকেশধাতু নিধানকৃত চৈত্য বিহার, চিংমরুন বৌদ্ধ বিহার, রাইনখ্যং বগলতলী ও হাজাছড়ি বৌদ্ধ বিহার, চন্দ্রঘোনা রায় সাহেব খোয়াইঞ প্র চৌধুরীর ক্যং ও জাদি চৈত্য, রেইস্যা বিলি সদ্ধর্ম জ্যোতি বিহার ও মনারাম বৌদ্ধবিহার, বান্দরবানে বোমাং রাজ বিহার, রামগড়ে মহামুনি মন্দির, মানিকছড়িতে মংরাজা বিহার, খাগড়াছড়ি, মহালছড়ি ও চেক্সী বড়াদমে বিশালকায় বুদ্ধমূর্তি প্রতিস্থাপিত মন্দির ও ক্যং ব্যতীত অন্য কোন স্থানে তেমন উল্লেখযোগ্য ক্যং বা মন্দির ছিল না। বিনয় সম্মত উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল নগন্য। চাকমা সমাজে দশশীল ধারী শ্রমণদের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত লুরীগনই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তারা কাষায় বস্ত্র পরিধান করে ব্রহ্মচারী বেশে গৃহে বাস করে। আগরতারা নামক ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মৃত দেহ সংস্কার ও অন্ত্যেষ্টি, ভাতদ্যা বা পিণ্ডদান, জাদিপূজা

প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে পৌরহিত্য করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ভিক্ষুদের ভূমিকা প্রায়ই পরিহীন হয়ে গিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম কি তা সম্যকভাবে জানা কঠিন হয়ে পড়ে। বৌদ্ধোচিত আচার আচরণ ও কার্যকলাপ হল অন্তর্হিত। অকুশল চিন্তাভাবনা ও অকুশল কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজ মাথাভারী হয়ে উঠল। ফলে তার অধ্যাত্ম ব্যাহত হয়ে একই বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে গেল। সেই বৃত্ত থেকে পরিত্রানের লক্ষ্যে মানুষের সাধ্যায়ত্ত জাগতিক অনেক পূজা অনুষ্ঠানের প্রচলন হল। পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল কামনায় চুমলাং, ধানমানা, মাথাধোয়া, বুরপাড়া, ধর্মকাম, কেড়পূজা এবং রোগমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় গাণ্ডপূজা প্রভৃতি ডালি বা প্রাণী বলি সংযুক্ত পূজা অনুষ্ঠান প্রচলিত হল। একটি ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করলে বৌদ্ধগণের এই অবস্থার করুণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। তাই আমি প্রসঙ্গ ক্রমে উপস্থাপন করতে চাই। ষাটের দশকে এতদঅঞ্চলের পঁচসহস্রাধিক বৌদ্ধ এতদঅঞ্চল ছেড়ে ভারতের অরুনাচল ও মিজোরামে চলে যায়। তখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলছিল। পাকিস্তানে বৌদ্ধগণ নিগৃহীত হওয়ার কারণে তারা এখান থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এই কথা বলে ভারত বিশ্বের বৌদ্ধ রাষ্ট্রসমূহে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে। পাকিস্তান তখন ভারতের সেই অভিযোগ খণ্ডন করে এভাবে—কোন বৌদ্ধ পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়নি। যাদের কথা ভারত বলছে তারা বৌদ্ধ নয়, তারা জুমিয়া বা জুম্মা। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে অস্থায়ী জুমচাষকারী এই জুম্মারা অশিক্ষিত এবং এতই আহাম্মক ও অজ্ঞ যে, এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে জুম চাষ করতে করতে কখন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করেছে তাও তারা জানেনা। দুঃখজনক হলেও সত্যযে পাকিস্তানের এই অপব্যবহার মুখে এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধদের তরফ থেকে জোর প্রতিবাদ করার মত যুক্তি ও সামর্থ্য ছিলনা।

এই শতাব্দীর ষাটের দশকে এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধদের কিরকম অবস্থা ছিল একয়টি উদাহরণে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাত্র দু'তিন দশক পরে বৌদ্ধদের এই অবস্থার কি অভাবিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা এ প্রবন্ধের প্রারম্ভে বর্ণিত WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS REVIEW তে প্রকাশিত বাক্যে আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় নয়কি?

বৌদ্ধগণের এত দ্রুত পরিবর্তন অর্থাৎ ধর্মীয় উন্নয়ন তা কিভাবে সম্ভব হল? এক কথায় এর সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় কিংবা কারো একক প্রচেষ্টায় একটি সমাজের আমূল পরিবর্তন বা উন্নয়ন ঘটে তাও সঠিক নহে। তবে এই উন্নয়নের মূল ধারা যেভাবেই প্রবাহিত হোক না কেন, অদ্য আমরা যে মহান আর্য্য পুরুষের নামে এই ভাবনা বিহার উৎসর্গ করছি সেই মহান সাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভাস্তে) সেই মূলধারায় দ্রুতগতি সঞ্চার করেছেন একথা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করা যায়।

উন্নয়নের এই প্রয়াস শুরু হয় এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। আজিকার এই সাধক পুরুষ তখনকার তরুন ভাবুক রথীন্দ্র চাকমা দুঃখ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ১৯৪৯ ইংরেজী ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে চট্টগ্রাম শহরের নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে তৎকালীন বিহারাধ্যক্ষ উচ্চ শিক্ষিত ভিক্ষু শ্রীমৎ দীপংকর স্থবিরের নিকট প্ররজ্যা গ্রহণ করেন এবং দীক্ষাগুরুর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। তাঁর দীক্ষাগুরু নাকি তাঁকে ভিক্ষুজীবন খুবই দুঃখের বলে মাঝে মাঝে বলতেন। এতে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর গুরু একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং খ্যাতনামা ভিক্ষু হয়েও দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। মাথা মুন্ডন করে কাষায় বস্ত্রধারী ভিক্ষু হলে কিংবা উচ্চ ডিগ্রীধারী হলেও দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়না। তাই তিনি দুঃখ হতে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় তার অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। গুরুর সাহচর্য ত্যাগ করে তিনি পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমার ক্রিয়াকাল আগে কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী ধনপাতা নামক স্থানে লোকালয়ের বাহিরে এক নির্জন অরণ্যে কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মাঝে মাঝে তিনি লোকালয়ে পিণ্ডাচরণ করার জন্য আসতেন। তাঁর শান্ত শিষ্ট আচরণ এবং নিস্পৃহ অথচ উদ্যমশীল ভাব দেখে গ্রামবাসীদের মন প্রসন্ন হত এবং তাদের নিস্তেজ মনে প্রাণ সঞ্চার হত। তিনি তখন রথীন্দ্র শ্রমণ নামে পরিচিতি লাভ করেন। গ্রামবাসীরা তাঁর জন্য এক উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করে লোকালয়ের বাহিরে এক কুটির নির্মাণ করে দেয় এবং মাঝে মাঝে অনেকেই সেখানে খাদ্যভোজ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য বস্তু দান করতে যায়। এমনি একসময় গ্রামবাসী লক্ষ্য করে তাঁর আহার ও নিদ্রাবিহীন কঠোর তপস্যার ফলে লব্ধ অলৌকিক কিছু ঘটনা। তাঁর তপস্যা এবং অলৌকিক ঋদ্ধির কথা পার্শ্ববর্তী জনগণের মুখে মুখে বর্ণিত হতে থাকে, কালক্রমে তা ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে। তাঁর মধ্যে যে মহান ত্যাগী এক মহাসাধকের অমিত সম্ভাবনা নিহিত তা অনেকেই অনুমান করল। তখনকার ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণ শ্রদ্ধার সাথে তাঁর এই মহতী সাধনা এবং সাধনা সিদ্ধির প্রত্যাশায় নিশি অবসানে পূর্বদিকে উজ্জ্বল সূর্যের উদয়কাল প্রতীক্ষা করার ন্যায় উদ্গ্রীব হয়ে রইল।

একটি সমাজের ব্যাপক বিবর্তনে একক ভূমিকার সমধিক গুরুত্ব থাকলেও সমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে অনুসঙ্গ প্রচেষ্টার গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। এই সময়ে ধর্মীয় উন্নয়নের জন্য এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণ অবশ্যই সচেষ্ট ছিল। চাকমা রাজগুরু শ্রীমৎ প্রিয়রত্ন মহাস্থবির এবং আনন্দ বিহারের বিদ্যোৎসাহী শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু ধর্মীয় উন্নয়নে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। রাজমাটিস্থ সরকারী কর্মচারী বাবুবুন্দ ১৯৩৪ ইং সনে এই আনন্দ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু লুরীদের ব্যবহৃত আগরতারা নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয় যে আগরতারা সমূহ মূল ত্রিপিটকের সূত্র থেকে সংকলিত। তবে দীর্ঘ সময়ে বার বার অনুলিখনের ফলে বিকৃত হয়ে যায় এবং দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। আগর তারার এই নূতন

পরিচয়ে প্রমাণিত হল চাকমাগণ আদিকাল থেকে বৌদ্ধধর্মকে অন্তর্জীবনে লালন করে এসেছে। অথচ তা সবার কাছে ছিল অজ্ঞাত। এতে সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন মহল নূতন এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল যার ফলে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরনের জন্য অনুকূল প্রেক্ষাপট রচিত হল। এই অনুকূল প্রেক্ষাপট রচনার মূলে আরো অনেকের ভূমিকা ছিল যা বলা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজন। রাইংখ্যং উপত্যকায় কতুবদিয়া গ্রামের অধিবাসী রুদ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যার সন্তান ফুলনাথ তঞ্চঙ্গ্য ১৯৩৮ ইং সনে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তত্রত্য এলাকার বগলতলী বৌদ্ধ বিহারে শ্রীমং উঃ তিসস মহাস্থবিরের নিকট ১৯৪২ ইং সনে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তখন শ্রীমং অগ্ৰবংশ ভিক্ষু নামে পরিচিত হন। জরাজীর্ণ সমাজের সংস্কারের জন্য ধর্মই একমাত্র হাতিয়ার মনে করে ধর্ম প্রচারের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তিনি ধর্ম শিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া ইছামতী ধাতু চৈত্য বিহারে শ্রীমং ধর্মানন্দ মহাস্থবির ও পরে একই জেলার বাগোয়ান ফরাচিং বিহারে বাগী প্রবর ও বিদর্শনাচার্য্য শ্রীমং আনন্দ মিত্র মহাস্থবিরের অন্তর্বাসী হয়ে ধর্ম বিনয়াদি ত্রিপিটক শিক্ষা করেন। প্রতিরূপ দেশ বার্মায় অধিকতর ধর্মবিনয় শিক্ষার মানসে তিনি ১৯৪৮ ইং সনে সুদূর রেঙ্গুনে গমন করেন। তথায় তিনি ত্রিপিটক অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রে যোগ দেন। ১৯৫৪-৫৬ সালে রেঙ্গুনে আন্তর্জাতিক ভাবে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্ম মহা সম্মেলনীতে সংগীতি কারক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘর্ম প্রবর্তক চাকমা রাজা মেজর ত্রিদিব রায় তাঁকে তদানীন্তন পাকিস্তানের বৌদ্ধগণের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে ঐ সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন ও সার্বিক ব্যবস্থা করে ছিলেন। রাজা বাহাদুর তাঁকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পূর্বক চাকমা রাজাশুরূপদ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি ত্রিপিটক শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯৫৮ ইং সনের মার্চ মাসে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ধর্ম বিনয়ে সুশিক্ষিত ও কঠোর পরিশ্রমী হওয়ায় সহজেই এতদঞ্চলের শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণীর মধ্যে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ধর্ম প্রচার সহজতর করার মানসে ১৯৫৯ ইং সনে তিনি পার্বত্য চট্টল ভিক্ষু সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সৌভাগ্যক্রমে বহু শিক্ষিত তরুণ দলে দলে উপসম্পদা গ্রহণ করতে থাকে। সমিতির সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সমাজে সর্বস্তরে ধর্মীয় প্রেরণার জোয়ার আসে। প্রায় প্রত্যেক বৌদ্ধগ্রামে বিহার বা ক্যং প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় পর্বাদি নিয়মিত পালিত হতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে লুরীদের প্রাধান্য লোপ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কার প্রসূত চুমুলাং, থানমানা, গাঙপূজা, শিবপূজা প্রভৃতি বলিযুক্ত পূজা পার্বনাদি রহিত হয়ে যায়। প্রকৃত বৌদ্ধ কি তা ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রচার করা হল। ক্রমে ক্রমে এতদঞ্চলের বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্মকে জানতে শুরু করল। ফলে ধর্ম উন্নয়নের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী হয়ে গেল।

১৯৬০ ইং সালে কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সাড়ে চারশত বর্গকিলোমিটার ব্যাপী এলাকা জলমগ্ন হয়ে বিস্তীর্ণ জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। ফলে এতদঞ্চলের অধিকাংশ বৌদ্ধগণ জলাশয়ের বাহিরে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। ধর্মের যে

আলো তাদের অন্তরে প্রজ্বলিত হয়েছিল সে আলো নির্বাপিত হয়নি, বরঞ্চ অধিকতর প্রোজ্বল হয়ে উঠল এবং নূতন বসতিস্থানে পূর্ণোদ্যমে ক্যং-প্রতিষ্ঠা করা হল ধর্মীয় পার্বনাদি নিয়মিত পালিত হতে থাকে।

ধনপাতার গভীর অরন্য হতে তৎকালীন সাধক প্রবর রথীন্দ্র শ্রমণ জনৈক শ্রদ্ধাবান দায়ক নিশিমনি চাকমার আমন্ত্রণ ক্রমে ১৯৬০ সনে মাইনী উপত্যকার দিঘীনালায় স্থানান্তর গ্রহণ করেন। তথায় তাঁর অবস্থানের জন্য একটি সাধনা কুটির নির্মাণ করা হয়। তিনি সেখানে ১৯৬১ সনে উপসম্পদা প্রাপ্ত হলে শ্রীমৎ সাধনানন্দ ভিক্ষু নামে তাঁকে অভিহিত করা হয়। অরন্য বা বনে সাধনা করেছিলেন বলে তিনি বনভান্তে নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৭১ সনের মাঝামাঝি লংগদু মৌজায় হেডম্যান বাবু অনিল বিহারী চাকমা যিনি পরবর্তী কালে লংগদু উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছিলেন তার এবং অন্যান্য দায়কের আমন্ত্রণে তিনটিলায় আগমন করেন।

আজ হতে আড়াই হাজার বৎসরেরও আগে তথাগত বুদ্ধের জীবিতকালে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর দুহিতা মহোপাসিকা বিশাখা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সুতা কেটে রং করে বস্ত্র বয়ন ও চীবর সেলাই করে ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে কঠিনচীবর দান করেছিলেন। সেই একই নিয়মে কঠিনচীবর দান পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভান্তে দায়ক দায়ীকাগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৭৩ সনের ৪ ও ৫ নভেম্বর লংগদু তিনটিলাতে এই মহতী কঠিন চীবর দানোৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিশ্বের কোন বৌদ্ধ রাষ্ট্রে এই নিয়মে কঠিন চীবর দানের আয়োজন করা হয় না। পর বৎসর ১৯৭৪ সনের ১৮ই নভেম্বর চাকমা রাজ বিহারে ঐ একই নিয়মে রাজ গুরু শ্রীমৎ অঘবংশ মহাস্থবিরের তত্ত্বাবধানে চাকমা রাজ পরিবারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কঠিনচীবর দানোৎসবে শ্রদ্ধেয় বনভান্তেকে আমন্ত্রণ করা হলে তিনি সর্বপ্রথম রাঙ্গামাটিতে শুভাগমন করেন। রাঙ্গামাটিতে তাঁর স্বল্প কালীন অবস্থানের জন্য রাজ পরিবারের নিজস্ব জায়গায় লোকালয়ের অনতিদূরে একটি অস্থায়ী কুটির নির্মাণ করা হয়। রাঙ্গামাটির ধর্মপ্রাণ দায়ক দায়ীকা, চাকমা রাজ পরিবারের সদস্য বৃন্দ শ্রদ্ধেয় বনভান্তেকে রাঙ্গামাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি ১৯৭৭ ইং সনের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সশিষ্য রাঙ্গামাটিতে আগমন করেন। বিহার নির্মাণের জন্য বর্তমান রাজমাতা আরতিরায় ও চাকমারাজা দেবাশীষ রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজবাড়ীর অনতিদূরে পনের একরাধিক ভূমি দান করেন। আজ এই ভূমির উপরই রাজবনবিহার পরিবেণ গড়ে উঠেছে।

১৯৮১ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার কর্তৃক উপহার প্রদত্ত বোধি চারা রোপনের মাধ্যমে রাজবনবিহার পরিবেণে প্রথম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। সেই

অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার হাই কমিশনার চরিতা রানা সিংহা, ও বার্মার (বর্তমানে মায়ানমার) রাষ্ট্রদূতদ্বয় সঙ্গীক এবং ভারতের হাই কমিশনার মুচুন্ড দুবে উপস্থিত ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রী এই বোধিবৃক্ষ চারা স্বহস্তে রোপন করেন। এই অনুষ্ঠানে বনভান্তেকে মহাস্থবির বরন করা হয়।

১৯৭৭ সন হতে ১৯৯৩ সন পর্যন্ত মাত্র এই মৌল বৎসর সময় কালের মধ্যে রাজবনবিহার পরিবেণ অপূর্ব সজ্জায় পরিপূর্ণ হয়ে একটি আন্তর্জাতিক তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। গুরুত্ব সহকারে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পৃথিবীর স্বাধীন বৌদ্ধ রাষ্ট্র থাইল্যান্ডের রাজগুরু ধর্মাদিরাজ মহামুনি দু'বার এই বনবিহার পরিবেণে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের দর্শনে আগমন করেন।

রাজবনবিহার এলাকায় প্রাপ্ত সীমায় বোধি বৃক্ষ, তিস্তু সীমা, বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র বা কুটির, এবং বেইন ঘর অবস্থিত। কেন্দ্রস্থলে পাশাপাশি মূল বিহার, উপাসনা বিহার এবং শ্রদ্ধেয় বনভান্তের অবস্থানের জন্য ভাবনা বিহার নির্মাণ করা হয়েছে। এতদঞ্চলের দায়ক দায়ীকাগণের দানকৃত স্বর্ণ রোপ্যাদি অষ্টধাতু সমন্বয়ে দুটি মনোরম বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ পূর্বক মূল বিহার ও উপাসনা বিহারে স্থাপন করা হয়েছে। ভাবনা বিহারের সম্মুখে দীর্ঘ ও প্রশস্ত চংক্রমন গৃহ অবস্থিত। বনবিহারে প্রত্যহ আগমনকারী শত শত ধর্মপ্রাণ নরনারী উপাসনা বিহারের অনতিদূরে অবস্থিত দেশনালায়ে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবন ও বিবিধ উপচারে বনভান্তেকে পূজা করে কৃতার্থ হন। এর সংলগ্ন নির্মীয়মান তিস্তু শ্রমণের দোতালা আবাসিক ভবন, এই ভবনের নীচতলায় বনবিহার পরিচালনা কমিটির কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। উপাসক উপাসিকাদের উপসোধ গৃহ আগত দায়ক দায়ীকাদের অস্থায়ী অবস্থানের জন্য বাসস্থান, বিশাল অনুষ্ঠানোপযোগী ময়দান এবং সর্বোপরি সবুজ ও সতেজ বৃক্ষ রাজি শোভিত রাজ বনবিহার পরিবেণ মনোরম স্বর্গীয় সুখমা মন্ডিত।

এতদঞ্চলের বিভিন্নস্থানে খাগড়াছড়ি জেলায় চেঙ্গী অঞ্চলে বোয়ালখালি বা দিঘীনালা অঞ্চলে, রাঙ্গামাটি জেলায় বাঘাইছড়ি লংগদু, সুবলং, রাইংখ্যাং এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শাখা স্বরূপ বনবিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বন্দুকভাঙ্গা মৌজার যমচুক এবং শাপছড়ি মৌজার ফোর মোইন এতদুভয় পর্বতের শীর্ষে বিহার প্রতিষ্ঠা পূর্বক ধর্মীয় পতাকা উত্তোলিত রাখা হয়েছে। সুবলং ও রাইংখ্যাং উপত্যাকার মাঝামাঝি অবস্থিত জাদিচুকেও এবস্থি বিহার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে বনবিহার পরিবেণ ধর্মীয় সজ্জায় সজ্জিত হয়ে এতদঞ্চলে ধর্ম পিপাসু নরনারীগণের এক মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এতদঞ্চল বৌদ্ধ বিশ্বের জন্য ও গৌরব জনক মনে করার কারন রয়েছে। শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়ীকাগণের

নিঃস্বার্থ দান এবং রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটির কর্তব্যনিষ্ঠ সুদক্ষ পরিচালনাই এই সমৃদ্ধির মূলে নিহিত রয়েছে। সর্বোপরি মহান আর্য্য পুরুষ বনভাস্ত্রের ঋদ্ধ অনুভাবেই বলেই এমন অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে তা বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি বার বার বলেছেন নশ্বর জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে, জন্মজ্বর ব্যাধি মৃত্যু স্বভাব ধর্ম দর্শন করে, দুঃখময় সংসারে সব অনিত্য মনে করে, দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য, সত্যকে দর্শন করা, জানা ও বুঝার জন্য, উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম কি, নির্বান কি, মানবমুক্তি কিসে হয় জ্ঞাত হবার জন্য তিনি ধন জন, আত্মীয় পরিজন পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গৃহণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। তার এই কথায় জানা যায় যে, তিনি প্রথম থেকেই দুঃখকে উপলব্ধি করেছিলেন, সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করে দুঃখমুক্তির আকাংক্ষায় সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর দেশনা দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় চারি আর্য্য সত্য ভিত্তিক। তাঁর ভাষা সহজ সরল অথচ প্রাজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী যা সাধারণ মানুষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করে। তাঁর উপদেশ বাক্য এমন ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ যে, শ্রবনমাত্রই মনের গভীরে প্রোথিত হয় এবং ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, যাতে ব্যক্তি বিশেষে তা পালন করতে সচেষ্ট হয়। তাঁর দেশনায় ত্রিপিটকের পালি সূত্রের বিষয়বস্তু স্থানীয় ভাষায় সহজ সরল ভাবে ব্যাখ্যা করে সদ্ধর্মকে সর্বস্তরের জনগণের বোধগম্য করেছেন। অনেকসময় তিনি ব্যক্ত করেন বিএ, এমএ পাশ করলে, এমনকি লন্ডনে প্রাপ্ত উচ্চ ডিগ্রী থাকলেও সদ্ধর্মকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কাজেই বিএ, এমএ, বা লন্ডন ডিগ্রীধারীদের এইসব ডিগ্রী মিথ্যা। আসলে তাঁর আসল বক্তব্য হল সদ্ধর্মকে বুঝতে হলে এসব ডিগ্রীর প্রয়োজন হয়না। আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকলে, কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করে বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি পরম শ্রদ্ধা থাকলে বুদ্ধ ধর্ম সংঘের মহিমা জানার জন্য মন নিবদ্ধ হয় এতে সদ্ধর্মকে জ্ঞাত হবার পথ সুগম হয়ে যায়। তাঁর এই দেশনায় আজ আপামর জনগণ সদ্ধর্মকে উপলব্ধি করেছে। হাজার হাজার নরনারী তাঁর মুখে দেশনা শোনার জন্য প্রত্যহ রাজবন বিহারে শ্রদ্ধাচিহ্নে আগমন করছেন। বিশাল সমাজের উন্নয়ন সমষ্টিগত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হতে পারে। তবে সেই প্রচেষ্টাতে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হলে উন্নয়ন অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়ে থাকে তা চিরন্তন সত্য। এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণের অবস্থার স্বল্পকালীন ব্যবধানে যে অভাবিত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে তা মহান আর্য্য পুরুষ বনভাস্ত্রের ঋদ্ধ অনুভাবেই হয়েছে একথা প্রবন্ধে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রের মহতী সাধনা এবং সিদ্ধি সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। তিনি দুঃখকে জানা এবং দুঃখমুক্তির উপায় স্বরূপ সদ্ধর্মকে অধিগত হবার আকাঙ্ক্ষায় প্রব্রজ্যা গৃহণ করেছিলেন একথা প্রবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে। সংসার দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, ইম্পিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ ইত্যাদি পরম সত্য রূপে বিদ্যমান। ইহা

দুঃখ আৰ্যসত্য। সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান খন্ডই দুঃখ। এর কারণ তৃষ্ণা। সেই ভবোৎপত্তির জন্য অভিনন্দন কারিনি নন্দীরাগ সহগতা কামতৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা এবং বিভবতৃষ্ণাই হচ্ছে সকল দুঃখের মূল কারণ। ইহা দুঃখ সমুদয় আৰ্যসত্য। সেই তৃষ্ণার অশেষ রূপে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি হচ্ছে দুঃখ নিরোধ আৰ্যসত্য। পরম শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রে দুঃখময় সংসার আৰ্বত হতে মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় পরম পরাক্রমে সিংহ বিক্রমে সংগ্রাম করে এসেছেন। যুদ্ধ বিজয়ী বীর তুল্য তিনি এখন বিজয় আসনে সমাসীন। তার প্রতি একপলক নিরীক্ষণ করলেই আমরা বুঝতে পারি তিনি নির্লিপ্ত, নিষ্পৃহ, তাঁর সকল তৃষ্ণা অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি মুক্তিকামী নরনারীগণকে তথাগত বুদ্ধ প্রদর্শিত দুঃখমুক্তির উপায় আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশনা করছেন। অগণিত নরনারী তাঁর চতুরায্য সভ্য দেশনা শুনে অমৃতালোকে উদ্ভাসিত হচ্ছে।

তাঁর এই মহতী সাধনা এবং সদ্ধর্ম দেশনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চিরায়ত করা প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং সদ্ধর্ম অধিগত হয়েছেন। সেই সদ্ধর্মকে অবলম্বন, অনুধাবন, ধারণ, অনুশীলন এবং বহুজনের হিতের জন্য, দেবমनुष্যের সুখের জন্য প্রচারের নিমিত্ত তিনি বহু শিষ্য তাঁর অনুশাসনে রেখে শীল সমাধি প্রজ্ঞার সাধনা শিক্ষা দিচ্ছেন। রাজ বন বিহারে এবং অন্যান্য বিহারে পঞ্চাশ জনের অধিক ভিক্ষু এবং ত্রিশ জন শ্রমনের সাধনায়রত আছেন। গভীর অরণ্যে বনাচারী হয়ে ধূতাজ্জধারী ভিক্ষুও রয়েছেন। তন্মধ্যে সর্ব শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ যোগানন্দ ভিক্ষু, শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু, শ্রীমৎ অক্ষরা নন্দ ভিক্ষু অন্যতম। ইতিমধ্যে কেহ কেহ উচ্চতর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস তাঁদের এই মহতী সম্ভাবনায় সাফল্যের আলোকে আমাদের ভাবীকাল আরো মহিমাম্বিত হয়ে উঠবে। ষাট দশকের মধ্যে এতদঞ্চলের বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্ম কি তা জানতে পেরেছিল, নব্বই এর দশকের গোড়ায় তা গভীরভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে সক্ষম হ'ল।

পরিশেষে কামনা করব জগতের দুঃখযজ্ঞগার ঔষধস্বরূপ, সর্ব সম্পদ ও সুখকারক বুদ্ধশাসন লাভ সৎকারের সহিত চিরস্থিতি হউক।

জগদ দুঃখৈক ভৈষজ্যং
সর্ব সম্পদ সুখ করং
লাভ সৎকার সহিতং
চিরং তিট্‌ততু (বুদ্ধ) সাসনং।

(আচার্য শান্তি দেব)
বোধিচর্যাবতারঃ ১০ঃ ৫৭

(অনুষ্ঠানোপলক্ষে প্রবন্ধটি ধর্মীয় সেমিনারে আলোচিত হয়)

প্রকৃত আমি কে ?

শান্তিময় চাকমা

প্রধান শিক্ষক

রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়

পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি অলীক-অস্থায়ী। তাই বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ কঠে ধ্বনিত হয়েছিল, “সম্ভে সংখারা অনিচ্চা, সম্ভে সংখারা দুক্খা, সম্ভে সংখারা অনাত্তা।” সবকিছু স্রোতমুখে জল বৃদবৃদের মত আসে আর মিলিয়ে যায়। যা ক্ষণিক তা সুখের হতে পারেনা এবং বাস্তব বলেও গ্রহণ করা যায় না। তাই লোক বলে কথিত জীব ও জগতের পিছনে যে আত্যন্তিক সত্য তাও বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকার করা হয়না। লোক শুধু প্রতিভাস মাত্র। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান –এ পঞ্চ স্ফঙ্কের সমবায়ে যে সত্তা বা ব্যক্তি জেগে উঠে তা একটি প্রতীতি বা ব্যবহারিক নাম মাত্র। এখানে ব্যক্তি সত্তা বলতে প্রকৃত পক্ষে কিছুই নেই। আছে শুধু ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহ। এখানে ধর্ম হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সংস্কার হচ্ছে কারণ বা প্রত্যয় সমূহের সংযুক্ত ক্রিয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ জগৎ সংসারে অহং বা আমিত্ব নিয়ে আমাদের অহংকারের অন্ত নেই। মিথ্যা জগৎ রচনায় আমরা ব্যতিব্যস্ত। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, যে আমিত্বকে কেন্দ্র করে আমাদের এত মিথ্যা অহংকার ও গৌরব সে আমি কে? তথাগত বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন আড়াই হাজার বছর আগে যে যুগে বিজ্ঞানের প্রযুক্তি ছিল অজানা। কিন্তু বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের প্রযুক্তির যুগ। আমাদের দেহ যন্ত্রের উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে প্রকৃত আমি কে তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আমরা জানি আমাদের দেহের অনেক যন্ত্রের মধ্যে চোখ অন্যতম যন্ত্র। অপরাপর যন্ত্রের মত এটার কার্যকারিতা পরিবর্তিত হতে পারে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি শক্তিও কমতে থাকে। চোখ যদি মাত্র যন্ত্রই হয় তাহলে এ যন্ত্র ব্যবহার করে কে? যন্ত্র হচ্ছে একটি কল যা দ্বারা কোন কাজ সহজে সুসম্পন্ন করা যায়। ইহা একটি অস্থায়ী কৌশল। এ অর্থে চোখ একটি সুন্দর যন্ত্র। এ চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারি। একজন স্বাভাবিক মানুষ এ চোখ দিয়েই শতকরা আশী ভাগের অধিক জ্ঞান লাভে সমর্থ। কিন্তু ব্যাপার হলো এ চোখ অস্থায়ী। এ চোখ বার্ধক্যের অধীন, ব্যাধির অধীন এমন কি ধ্বংসের অধীন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ চোখের কার্যকারিতাও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। একটি যন্ত্রের কর্ম সম্পাদনের

কৌশল পরিবর্তন যোগ্য। কিংবা একটির সঙ্গে আরো যন্ত্র সংযোজন করে তার কর্মক্ষমতা বাড়ানোও যেতে পারে। এ কথা চোখের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা এ জন্য চশমা ব্যবহার করে নৈকট্য-দৃষ্টি হীনতা বা দূর-দৃষ্টি হীনতা দূরীভূত করি। দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে চোখের দৃষ্টি অনেক অনেক দূরে প্রসারিত করা সম্ভব। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম জিনিসও অবলোকন করা যায় যা খালী চোখে দেখাই যায়না। কাজেই চোখ যে শুধু যন্ত্র মাত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, যন্ত্র এবং যন্ত্র ব্যবহারকারী দুটি আলাদা জিনিস। যন্ত্র একটু দৃশ্যমান বস্তু। এটা পরিবর্তনশীল, অবনতিশীল এবং ধ্বংসশীল। যন্ত্রের পরিবর্তন, অবনতি বা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকারীও পরিবর্তন, অবনতি বা ধ্বংস হয় বলে মনে করা যায় না। একইভাবে শরীর যন্ত্র এবং শরীর যন্ত্র ব্যবহারকারী এদুটি আলাদা জিনিস। শরীর পরিবর্তিত হয়, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা ধ্বংসও হয়। কিন্তু এ সত্য শরীরের মনিবের উপর প্রযোজ্য নহে অর্থাৎ মনিব ভিন্ন।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎকর্ষের যুগে এ প্রশ্ন আরো বেশী সাদৃশ্য পূর্ণ। যেমন, ক এর হৃদপিণ্ড অপসারণ করে খ এর দেহে সংযোজন করা যায়। কিন্তু তজ্জনিত কারণে খ কখনো ক তে পরিণত হয় না।

ধরা যাক দুর্ঘটনা জনিত কারণে গ এর মস্তিষ্ক কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে সে অতীত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সে এখনো বুঝতে পারে এবং আলাপ আলোচনা করতে পারে দৃশ্যত সে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা কিছুটা হারিয়ে ফেলেছে মাত্র। যার মস্তিষ্ক যন্ত্র কিছুটা বিকল এবং যে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করছে সে লোকটার সঙ্গে আগেকার লোকটার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ মনিব ঠিকই আছে। এ উভয় ক্ষেত্রে বলা যায় যে, শুধু যন্ত্রটা অপসারিত হয়েছে কিংবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে সকল যন্ত্র সমূহ দ্বারা শরীর গঠিত সে সকল যন্ত্র সমূহের ব্যবহারকারী কে?

সুরঙ্গমা সূত্রে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য আনন্দের মধ্যে একটি সুন্দর কথোপকথনের উল্লেখ আছে। বুদ্ধ আনন্দের কাছে জানতে চাইলেন কে বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছে, কে তাঁর ধর্মোপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনতেছে এবং কে বুদ্ধের বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এ প্রশ্ন আনন্দকে পিনের খোঁচার মত পীড়া দিচ্ছিল। তিনি বললেন এগুলির মালিক শরীরের অভ্যন্তরে, শরীরের বাহিরে, চোখের নীচে ইত্যাদি। কিন্তু তথাগত বুদ্ধ কোন উত্তর অনুমোদন করলেন না। আনন্দ দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। বুদ্ধের সর্বক্ষণিক ও

একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে একজন সত্যার মৌলিকতা এবং সত্যতা জানা দরকার। এ ব্যাপারে আনন্দ মারাত্মকভাবে অকৃতকার্য হলেন। তাই বিনীত ভাবে এ ব্যাপারে আলোকপাত করার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ জানানলেন।

তাদের কথোপকথনের মূল সমস্যা হলো হৃদয় বা চেতনা। তবে মনে রাখতে হবে এখানে হৃদয় বলতে শরীরের অভ্যন্তরস্থ হৃদয় নহে। আমরা কথায় কথায় বলে থাকি যে সবার হৃদয় জয় করেছে। এ হৃদয় শব্দকে বুঝার সুবিধার্থে আমরা মন হিসাবেও ব্যবহার করে থাকি।

বুদ্ধ বললেন, ‘মালিক কে’ এ সম্বন্ধে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সেটাই সমস্যার মৌলিক উৎস। বালিকে যে ভাবেই রান্না করা হউক না কেন তা কখনো ভাতে পরিণত হবেনা। তদ্রূপ সংবেদী সত্তাগণ যতদিন প্রকৃত সত্যের ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হবেনা এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হবেনা ততদিন তারা দুটি মৌলিক সত্যের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকবে।

প্রথমতঃ সকল সত্তাগণ বিশ্বাস করে যে, বস্তু অনুরক্ত মনই তাদের মৌলিকত্ব। এটা একটা মিথ্যা ধারণা এবং অবিচ্ছিন্ন জন্ম মৃত্যুর প্রধান কারণ বা মূল।

দ্বিতীয়তঃ সত্তাগণের প্রকৃত মৌলিক স্বভাব জ্ঞানালোক প্রাপ্তের মত বা নির্বাণ অবস্থায় স্থিত, জন্ম মৃত্যু বর্জিত এবং অত্যন্ত পরিশুদ্ধ বা নির্মল ও সচেতন। প্রতীয়মান সকল বস্তু, দেহ, মন এবং বিশ্বের সকল জিনিস সত্তাগণের মৌলিক স্বভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। কিন্তু বস্তু অনুরক্ত মন বস্তুর সঙ্গে এমনভাবে এঁটে থাকে যে, সত্তাগণ নিজের মৌলিক স্বভাব ভুলে যায়। বুদ্ধ আরো বলেছেন, “যদিও নিজেদেরকে সঠিকভাবে না জেনে দিব্যারাত্রি অনবরত কাজ করে চলে।”

এখন প্রশ্ন জাগে বস্তু অনুরক্ত মন কোনটা? এ প্রশ্নের জবাবে কি বলা যাবেনা ছোটকাল থেকে যাকে আমরা ‘নিজ’ বা ‘স্বয়ং’ বা ‘আমি’ বলে থাকি সেটাই বস্তু অনুরক্ত মন? স্বাভাবিকভাবে আমরা বলি “আমি যাই। আমি খাই, আমি কথা বলি” ইত্যাদি। বুদ্ধ সুরঙ্গমা সূত্রে এ ব্যাখ্যা নাকচ করে দিয়ে বলেছেন যে, এ বস্তু অনুরক্ত মন প্রকৃত আমি নহে, অর্থাৎ ‘আমি’ বা ‘স্বয়ং’ যার সঙ্গে আমরা অত্যন্ত শক্তভাবে যুক্ত সেটা প্রকৃত আমি নহে। বরং এটা হচ্ছে মন যা অনবরত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। মনের এরকম বস্তু হচ্ছে রূপ, শব্দ ধারণা ইত্যাদি যা মূহর্তে মূহর্তে পরিবর্তন হয়। কাজেই বস্তু অনুরক্ত মনের ইন্দ্রিয় লব্ধ বস্তু ও মূহর্তে মূহর্তে পরিবর্তন হয়। যেহেতু ইহা পরিবর্তনীয় কাজেই তা অস্থায়ী।

উপরোক্ত ধারণাকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য বুদ্ধ এবং রাজা প্রসেনাজিতের কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন বুদ্ধের অন্যতম

অনুসারী। বাষটি বৎসর বয়ঃক্রমে একদিন তাঁর খেয়াল হলো যে, তিনি আর বেশীদিন বেঁচে থাকবেন না। তাই বুদ্ধের নিকট গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায় কিনা তা জানার জন্য ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

বুদ্ধঃ আপনার শরীর এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে এটার মৃত্যু হবে?

রাজাঃ যখন কোন কাষ্ঠ খন্ড পোড়ানো হয় এবং শেষে নিঃশেষ হয়ে যায়, এ কথা আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বুদ্ধঃ আপনার ছেলে বেলার মুখমন্ডলের সঙ্গে বর্তমান মুখমন্ডলের তুলনা করা যায়?

রাজাঃ হে জগৎ পূজ্য, সেটা কিভাবে তুলনা করা যায়? আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মুখমন্ডলের চামড়া ছিল কোমল এবং মসৃণ। বর্তমানে মুখমন্ডলে শুধু কুষ্টিত রেখা নহে চুলও সাদা হয়ে গেছে এবং আরো অন্যান্য লক্ষণ বিচারে আমাকে বৃদ্ধ বলা যায়।

বুদ্ধঃ মুখমন্ডলের পরিবর্তন কি ইঠাৎ হয়েছে?

রাজাঃ না, জগৎ পূজ্য। এটা আমার অগোচরে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন হয়েছে। আমি লক্ষ্য করলাম এ পরিবর্তন দশ বছর সময়ের মধ্যে হয়েছে। না, এ পরিবর্তন বছরে বছরে হয়েছে অথবা মাসে মাসে বা দিনে দিনে হয়েছে। না, শুধু দিনে দিনে নয় আমার মনে হয় প্রকৃত পক্ষে এ পরিবর্তন হয়েছে প্রতি মূহর্তে। এ অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমি বুঝতে পারি যে, আমার শরীরের মৃত্যুও অবধারিত।

বুদ্ধ রাজার এ লক্ষ্যের সঙ্গে সম্মত হলেন। কিন্তু তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি রাজাকে বললেন যে, যদিও তাঁর শরীর ক্রমশঃ অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে তবুও তাঁর সচেতনতার মৌলিক স্বভাব আগের মতই রয়ে গেছে। এটা বুঝানোর জন্য বুদ্ধ নিম্নোক্ত প্রশ্ন করেন।

বুদ্ধঃ আপনি প্রথম কখন গঙ্গার পানি দেখেন?

রাজাঃ তিন বছর বয়সে দাদী মা ঐ নদী দেখতে নিয়ে যান। ওটাই আমার প্রথম দেখা।

বুদ্ধঃ গঙ্গা নদীর পানি সম্বন্ধে আপনার যে ধারণা ছিল, মনে করুন, বিশ বছর পর আবার দেখে সে ধারণা কি পরিবর্তিত হয়েছে?

রাজাঃ না। জগৎ পূজ্য। এমন কি এ বাষট্টি বছর বয়সেও গঙ্গা নদীর পানি সম্বন্ধে আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ধারণা একই রয়ে গেছে।

বুদ্ধঃ মহারাজা, আপনি বলেছেন আপনার মুখ মন্ডল কুঞ্চিত হয়েছে এবং চুলও সাদাটে হয়েছে। আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন মুখ মন্ডলে কুঞ্চিত রেখা ছিলনা। এখন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আপনি বৃদ্ধ। আপনার ধারণার মৌলিক স্বভাব ও কি একই ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?

রাজাঃ না, জগৎ পূজ্য, তা পরিবর্তিত হয়নি।

বুদ্ধঃ মহারাজ, ঠিক বলেছেন। আপনার মুখমন্ডল কুঞ্চিত হয়েছে কিন্তু ধারণার মৌলিকত্বের পরিবর্তন হয়নি। যে জিনিস কুঞ্চিত হয় তা পরিবর্তনও হয়। যে জিনিস কুঞ্চিত হয়না তা পরিবর্তনও হয়না। যে জিনিস পরিবর্তিত হয় তা ক্রমে ক্রমে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অপরিবর্তিত জিনিসের আদিও নেই অন্তও নেই। এটা মরতে পারেনা। তাহলে আপনার কেন ধারণা হলো যে মৃত্যুতে সবকিছু নির্বাপিত হয়ে যায়?

রাজা বুঝতে পারলেন যে, শরীরের মত যে কোন কিছু যার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয় তা অবনতি ঘটে সেটা সব সময় ক্রমাবনতিশীল এবং পরিণামে তার মৃত্যু ঘটে। অপর পক্ষে যা এক মূহর্তের জন্যও পরিবর্তিত হয়না তার মৃত্যুও ঘটেনা। একজন সত্ত্বার শরীর যদিও পরিবর্তনশীল, অবনতিশীল এবং মৃত্যুর অধীন কিন্তু সচেতনতার মৌলিক স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়না। এমন কি শরীরের মৃত্যু ঘটলেও ঐ স্বভাবের মৃত্যু নেই।

আগে বলা হয়েছে আমাদের শরীর একটি যন্ত্র এবং বস্তু অনুরক্ত মনই এ যন্ত্রের অধিকারী। কিন্তু বস্তু অনুরক্ত মন সব সময় পরিবর্তনশীল। কাজেই আরো গভীর পর্যায়ে সচেতনতার বৈশিষ্ট্যই শরীর যন্ত্রকে ব্যবহার করে। যদি শরীর যন্ত্র সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ধ্বংস হয়ে যায় ঐ সচেতনতার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়না। এটা সব সময় বর্তমান থাকে এমন কি শরীর যদি নাও থাকে।

বৌদ্ধ ধর্মের এ মতবাদকে আরো সুস্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য একটা উপমা দেওয়া যেতে পারে।

একটা বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানায় তাপ উৎপাদনের জন্য প্রচুর কয়লা পোড়ানো হয়। এ তাপ পানিকে উত্তপ্ত করে এবং উৎক্ষিপ্ত বাষ্প টারবাইন ঘুরায়। ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এ বিদ্যুৎ আমাদের ঘর আলোকিত করে। এভাবে সকল উপাদান সমূহ মূহর্তে মূহর্তে পরিবর্তিত হয়। স্থূল পদার্থ কয়লা থেকে সর্বশেষ পর্যায়ে আলো পর্যন্ত

সবকিছুই হলো শক্তির দৃশ্যমান রূপ। এ শক্তি অপরিবর্তনীয়। শক্তি বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয় এবং তা সত্ত্বেও এটা সকল সময়েই শক্তি হিসাবে থেকে যায়। এ শক্তি সকল সময়ে বর্তমান। জন্ম ও মৃত্যুর ধারণা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

আমরা প্রতিদিন দেখি সূর্য্য পূর্ব দিকে উঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু সূর্য্য কি প্রকৃত পক্ষে এভাবে ঘুরে? না। পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দিকে তাকাচ্ছি বলে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আসলে পৃথিবীই তার অক্ষের উপর আবর্তন করে। সূর্য্যের কোন গতি নেই, তার উদয়-অস্তও নেই। রাত্রে যদিও সূর্য্যকে দেখা যায় না এটা তার নির্দিষ্ট জায়গাতেই বর্তমান থাকে।

এখানে উল্লেখিত রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে যখন তথাগত বুদ্ধের যথোপকথন চলছিল তখন বুদ্ধের একনিষ্ঠ শিষ্য আনন্দও উপস্থিত ছিলেন এবং তথাগত বুদ্ধ তাঁকে বস্তু অনুরক্ত মন ও সচেনতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। বুদ্ধ একটা হাত উন্ডোলন করে আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন ‘কি দেখছো?’

আনন্দঃ আপনার খোলা হাত।

বুদ্ধ মুষ্টি বদ্ধ করে আবার আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন— ‘কি দেখছো?’

আনন্দঃ আপনার মুষ্টি বদ্ধ হাত।

বুদ্ধ কয়েবার হাত মুষ্টি বদ্ধ ও খোলার পর আবার আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন ‘কি দেখছো?’

আনন্দঃ আপনার হাত একবার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে আর একবার খুলতেছে।

বুদ্ধঃ আমার হাতের ব্যাপারে তোমার যে সচেতনতা তাও কি একবার খুলতেছে আর বন্ধ হচ্ছে?

আনন্দঃ না, জগৎ পূজ্য।

বুদ্ধঃ কোনটা স্থির আর কোনটা অস্থির?

আনন্দঃ আপনার হাত অস্থির আর আমার সচেতনতা স্থির। দৃশ্যমান বস্তুর অনবচ্ছিন্ন পরিবর্তনেও আমার চেতনার বৈশিষ্ট্য অনড় এবং শান্ত।

বুদ্ধ নিশ্চিত হলেন যে, আনন্দ সঠিকভাবে সত্য উপলব্ধি করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ষড়ায়তনের মাধ্যমে যা কিছু আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় বা উপলব্ধি জন্মে তা শুধু মাত্র

বস্তু অনুরক্ত মনের উপরেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যা আসল মন বা প্রকৃত আমি নহে। প্রকৃত আমি আরো গভীরে যাকে বলা হয় সচেতনতা। সত্ত্বার এ সচেতনতার মৌলিক স্বভাব অত্যন্ত ধীর স্থির এবং অচঞ্চল। দেহ ছাড়াও তার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে এবং এ সচেতনতাই নির্বাণ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একজন সত্ত্বাকে পরবর্তী জীবনে জন্ম জন্মান্তরে অনবচ্ছিন্নভাবে টেনে নিয়ে যায়।

সম্মে সত্ত্বা সুখিতা হোস্তু ।

গ্রন্থ পঞ্জী:

- ১। তিরঙ্গ মঞ্জুরী- বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা
- ২। অভিধর্ম দর্পন- শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
- ৩। মে ফ্লাওয়ার- সি. টি. শেন
- ৪। দ্যা বুদ্ধ এন্ড হিজ টিচিংস- নারদ মহাশয়ের



भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान
राष्ट्रिय शास्त्रीय नृत्य संस्थान
भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान, १९८०-८१